বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য, মাধ্যম, উপকরণ ও শৈলী

নিফাত সুলতানা*

সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশে শিল্পরূপ সৃষ্টি করা হয়। একজন শিল্পী তাঁর অনুভূতি, বোধ, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে তাঁর শিল্পের জগৎ সৃষ্টি করেন। শিল্পীর সৃষ্টি নানা রূপে প্রমূর্ত হয়। তাঁর ভাবনা-কল্পনার জগৎটি চিত্রকলায় উন্মোচিত হয় বস্তুজাগতিক উপাদান-উপকরণের আশ্রয়ে। শিল্পের জগৎটি প্রকাশিত হয় বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করেই, যদিও শিল্পবস্তু বস্তুজগতের নিয়মকানুনের অধীন নয়। আর এ কারণেই যুগ যুগ ধরে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন এবং করে চলেছেন নানা উপাদান-উপকরণ; আশ্রয় নিয়েছেন বিচিত্র করণকৌশলের। একটি চিত্রকর্ম গড়ে তুলতে হলে কী ধরনের উপকরণ নির্বাচন করতে হবে এবং কীভাবে তার প্রয়োগ ও সংরক্ষণ করতে হবে এসব বিষয় শিল্পীদের কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে আহরিত নানা ক্ষেত্রের নানা জ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগিয়ে চিত্রশিল্পের উপকরণের ভান্ডারকে করে তুলেছে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। চিত্রকলার আদিতম নিদর্শন যে গুহাচিত্র তার নির্মাণ প্রক্রিয়া ও উপকরণ নির্বাচন এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতাকে সম্ভবত মানুষ আজও ধারণ করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, শৈল্পিক চেতনার যে বিকাশ তার পরিধি আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতটুকু বিস্তৃত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে উপকরণ ও করণকৌশলের নানামুখী বিকাশের ধারা।

চিত্র বা মূর্তি মানেই একটি বিশেষ রূপকল্পের বহিঃপ্রকাশ। আর এই রূপকল্প সার্থক হয় শিল্পীর চিন্তাশক্তি ও মননের মাধ্যমে। শিল্পীর চিত্র-অঙ্কনে ফুটে উঠে বিষয়বৈচিত্র্য, আশ্রয় নেন বিভিন্ন মাধ্যম, উপকরণ এবং অঙ্কনশৈলীর। বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন।

*প্রভাষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাস্তবধর্মী ও বিমূর্ত দুই ধরনের চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী চিত্রই বেশি করত। এই চিত্রগুলোতে আমরা সমাজচিত্র বা সংস্কৃতির প্রতিফলন পাই। এই ধরনের বাস্তবধর্মী কোনো চিত্র যখন কোনো প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় তখন সেই চিত্রকে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের অনেক চিত্রই পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন প্রকাশনায়, ডাকটিকেটে, পোস্টারে এবং ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–জয়নুল আবেদিনের 'মই দেওয়া', কামরুল হাসানের 'তিন কন্যা' ও 'নাইওর' ইত্যাদি চিত্রসমূহ বাংলাদেশের ডাকটিকেটে প্রকাশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এস.এম. সুলতানের চটের উপর তেলরং-এ করা একটি শিরোনামহীন চিত্র প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'কালি ও কলম' নামক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকায়। এসব চিত্রশিল্প বেশকিছু রীতিনীতি, উপাদান, উপকরণ ও করণকৌশলের সমন্বিত রূপ। চিত্রশিল্পের জগৎ তৈরিতে তথা ছবি আঁকতে কিংবা বুঝতে হলে এসব রীতিনীতি, উপাদান, উপকরণ ও করণকৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হয়।

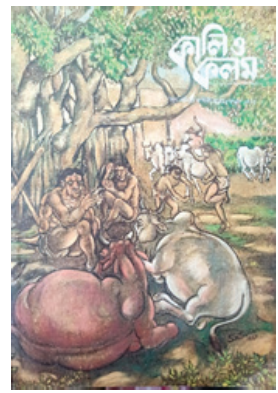

চিত্র-১ : (উপরে বামে) বাংলাদেশ ১০ টাকা ডাকটিকেট (১৯৮৬), জয়নুল আবেদিন, মই দেওয়া
চিত্র-২ : (নিচে বামে) বাংলাদেশ ৫ টাকা ডাকটিকেট (১৯৮৬), কামরুল হাসান, নাইওর
চিত্র-৩ : (ডানে) প্রচ্ছদ, কালি ও কলম, এস.এম. সুলতান, শিরোনামহীন

শিল্পের উপকরণ বলতে শিল্প সৃষ্টির জন্য যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয় তা বোঝায়। কোনো একক উপাদান নিয়ে চিত্রশিল্পের জগৎ গড়ে উঠতে পারে না। বহুবিধ উপাদান-উপকরণের সমন্বয়েই চিত্রশিল্পের বহুমাত্রিক জগৎ গড়ে ওঠে। শিল্পীর ভাবনা পরিকল্পনা ও রীতিনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় এই উপকরণসমূহ। প্রত্যেক

শিল্পীর ভাবনার জগৎটি ভিন্ন বলেই তাঁদের উপকরণ নির্বাচনে বৈপরীত্য দেখা দেয়। সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পী যে শিল্পকর্ম নির্মাণের পরিকল্পনা করেন, তা বাস্তবায়িত হয় উপকরণের আশ্রয়ে। একইভাবে সহজলভ্য উপকরণও সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে ছবির স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। উপকরণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া যদি সঠিক না হয় এবং উপকরণের মান ভালো না হলে উপকরণের ভেতর থেকে ছবি নষ্ট হতে থাকে। বাইরের আবহাওয়ায় যে ক্ষতি হয় তা নানা উপায়ে রক্ষা করা যায়, কিন্তু উপকরণের ক্ষতি ঠেকানো যায় না। মানবদেহের মতো তাই চিত্রকলার উপকরণের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এ প্রসঙ্গে Jonathan Stephenson বলেছেন–

> Paintings should always be treated as objects of value and as living things, which, like human beings, can only survive comfortably in certain conditions; they dislike intense cold and extreme heat, and are unhappy in damp or excessively dry conditions. Most of all, they do not like abrupt fluctuations in temperature and humidity, as this causes sudden physical changes which over a period of time fatigue both the paint and its support, resulting in damage. All though paintings cannot be allowed to dictate the conditions of life, as they might in the controlled atmosphere of a gallery, they should be accommodated thoughtfully within them. (Stephenson, 1993:185)

উপকরণের ব্যবহার সেই আদিকালের গুহাবাসীদের সময় থেকেই ছিল, কিন্তু উপকরণাদি ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সাদামাটা। চিত্র শুধু এক টুকরো সমতল জমি মাত্র যার উপরে রং ছড়ানো থাকে। এই সমতল জমিকে শিল্পী বিভিন্ন উপকরণ ও শৈলীর মাধ্যমে ধাপে ধাপে হারিয়ে যাওয়া বিষয়কে সাধারণের সামনে উপস্থাপন করে। ...শিল্পকলার মূল কথাই হচ্ছে অনেক অসংলগ্ন গৌণ উপকরণ ফেলে দিয়ে মূল জিনিসটি বাছাই করতে পারা,... যা কিছু মুখ্য এবং উল্লেখযোগ্য তাকে ফুটিয়ে তোলা। কারিগর তখনই শিল্পী হন যখন তিনি ছবির নানাবিধ উপকরণ রূপসৃষ্টির কাজে লাগান তার নিজস্ব কৌশলে (মিত্র, ১৯৮৮ : ৫৮-৫৯)।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের, বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের কাজ বিশ্লেষণ করতে গেলে এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা আবশ্যক হয়ে যায়। প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেহেতু ভারতে, তাই ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অথবা অনুপ্রেরণা তাঁদের কাজে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা যায়।

ভারতবর্ষের গুপ্ত যুগে সর্বপ্রাচীন চিত্রকলার চিন্তাভাবনা ও উপকরণের প্রয়োগ পদ্ধতি এক ধ্রুপদি ধারার সূচনা করে, যা চিত্রশৈলী ও মাধ্যমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ইউরোপীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতি বা সমসাময়িক বাইজেন্টাইনীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এর নির্মাণশৈলী। বলা যায় এটি টেম্পারা এবং ফ্রেস্কো এর মাঝামাঝি নির্মিত একটি নতুন ধরনের পদ্ধতি।

পাল যুগের পুথিচিত্র (চিত্র-৪) পরীক্ষা করে দেখা গেছে উপকরণ হিসেবে তাল ও তেরেট দুই ধরনের তালপাতা এই পুথিচিত্রগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ তালপাতা পুরু, অমসৃণ, দৈর্ঘ্য কম ও সহজেই ভঙ্গুর, যা পচনশীল বলে কম ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে তেরেট পাতা সূক্ষ্ম, পাতলা, লম্বা এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। তালপাতাকে পোকা ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং একে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য পাতাগুলোকে গোছা অবস্থায় মাসখানেক ডুবিয়ে রেখে পরবর্তীসময়ে পানি ঝরে গেলে পাতাগুলো আলাদা করে ছায়াতে শুকানো হতো। প্রতিটি পাতার দুদিক শঙ্খ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে সাজিয়ে সমান করে কাটা হতো। সাদা রং অর্থাৎ শঙ্খের গুঁড়া ছাড়াও এক ধরনের সাদা মাটি পাওয়া যেত, যা চিত্র-উপযোগী ক্ষেত্রান্তরণের জন্য ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়। পাল চিত্রগুলো গোয়াশ পদ্ধতিতে করা। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রঙের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্য জানা যায় কতবেল ও নিমের নির্যাস রঙের সাথে মিশ্রিত করা হতো। শঙ্খের গুঁড়া থেকে সাদা রং এবং কাজল থেকে তৈরি কালো রঙের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালযুগে চিত্রকররা কী ধরনের তুলির ব্যবহার করেছে তা আমাদের জানা নেই, তার কোনো নিদর্শনও বর্তমানে বিদ্যমান নেই (সরস্বতী, ১৯৭৮ : ১১১)। পুথির দুদিকে যে কাঠের পাটা সংযুক্ত হতো, তার ভিতরে ও বাইরে চিত্র অঙ্কিত হতো।

চিত্র-৪ : পাল পুথিচিত্র, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

মোগল চিত্ররীতি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র (আলম, ২০০৮ : ৯৩)। এ সময়ে মিনিয়েচার ও প্রতিকৃতি চিত্রণ উন্নতির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিল (আলী, ২০০৬ : ২৩৯)। চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একাধিক শিল্পী দ্বারা মিনিয়েচার অঙ্কন হতো (আকন্দ, ১৯৯৪ : ১৬৯)। কাগজের উপর ছবি আঁকার সময় প্রথমে খুব যত্ন করে বার্নিশ লাগিয়ে লাল কালি দ্বারা প্রাথমিক রেখা আঁকা হতো। এরপর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে শিল্পী তা কালো কালিতে আঁকতেন। তারপর কাগজের উপর পাতলা করে একটি সাদা রঙের আস্তরণ দেওয়া হতো। সবশেষে রাজকীয় জাঁকজমকের কারণে এ সময় সোনার জল, টার্কিস নীল এবং মূল্যবান পাথরের গুঁড়ার ব্যবহারও দেখা যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার জন্য তারা একটি চুল দ্বারা বিশেষ ধরনের তুলি তৈরি করতেন যাকে তারা বলতেন এক বলাকা তুলি। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে বাড়তি উজ্জ্বলতা আনার জন্য প্রচলিত ছিল বার্নিশ লাগানোর রেওয়াজ।

মুর্শিদাবাদ সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি মিশ্রিত পদ্ধতি চিত্রকলায় দেখা যায়। ইংরেজ কর্মচারীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আঁকা এসব চিত্রে ঘন জলরঙের বদলে ব্রিটিশদের অনুকরণে জলরং এবং পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পরবর্তীসময়ে টিলি কেটল, জন জোফানী, আর্থার ডেভিস প্রমুখ প্রায় ষাটজনের অধিক ইংরেজ শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন এবং তেলরং ও জলরংকে চিত্রকলার মাধ্যম হিসেবে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ঘটান (গুহ, ১৯৭৮ : ১৪-১৫)।

ব্রিটিশদের জলরং পদ্ধতি ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে উদ্ভাবিত বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোলকাতার কালিঘাটের পটচিত্রে প্রভাব ফেলে। পট অঙ্কিত হতো কাপড়ের উপর। কাপড়ের ওপর কখনো কেবল কাদামাটি বা গোবর মিশ্রিত প্রলেপ

দিয়ে তার ওপর তেঁতুল বিচির আঠা লাগিয়ে পট আঁকার জন্য মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী জমিন তৈরি করা হতো। ইটের গুঁড়োর সঙ্গে তেঁতুল বিচির আঠা মিশিয়েও জমিন এবং কখনো কাপড়ের উপর কাগজ লাগিয়েও অঙ্কন করা হতো (আহমেদ, ১৯৯৮ : ১-৯)। পরবর্তীকালে এই পটুয়ারা বিলেতি কাগজে অস্বচ্ছ জলরং ব্যবহার করতেন, যা ভারতীয় চিত্র মাধ্যমে আরেকটি নতুন দিকের উন্মেষ ঘটায়। কেবল লোকশিল্পে নয়, পাশ্চাত্যের রীতিতে নতুন মাধ্যম প্রয়োগ কোলকাতার শিল্পচর্চায় অত্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষ অংশে হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ওয়াশ পদ্ধতির সঙ্গে নিজস্ব পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কাব্যিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রাঙ্কন করেন (চিত্র-৫)। এ সময় ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রের করণকৌশল ও অজন্তার ভিত্তি চিত্রের রূপবিন্যাস ও নরনারীর রূপ সৌষ্ঠব আদর্শ হিসেবে গৃহীত হলো (ভট্টাচার্য, ২০১০ : ১২৯)।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথের এই অতীতচারিতাকে মেনে নিতে পারেননি, তিনি চেয়েছিলেন উদার আন্তর্জাতিকতা। ছবি আঁকার রীতি একান্তই তাঁর নিজস্ব (চিত্র-৬)। পদ্ধতিগত কৌশল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য–

> "আমি ছবিতে একবারেই রং দেই না, আগে পেন্সিল দিয়ে ঘসে ঘষে একটা রং তৈরি করি মানানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। তাতে রংটা বেশ জোরালো হয়।... রঙের উপর রং চাপাতে হয়, তবেই না ছবি হয়। .....আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, তখন আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমন করে তার এক একটা রূপ বের হয়, আমি মানুষের জীবনটাও এমন করে দেখি। (রফিক, ২০১২ : ১১৩)

চিত্র-৫ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
ভারতমাতা, জলরং, ১৯০৫

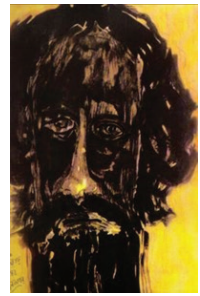

চিত্র-৬ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
আত্মপ্রতিকৃতি

ভারতীয় চিত্রকলার পরিসর ব্যাপক ও বহুমুখী। ভারতীয় চিত্রকলার ধারাবাহিকতায়ই মূলত বাংলাদেশের চিত্রকলায় নবতরঙ্গের সূচনা ঘটে। ফলে বাংলাদেশের চিত্রকলা রূপ-রীতির আলোচনায় তা হয়ে ওঠে একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার ঢাকায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে "গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট" স্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশের শিল্পচর্চার সূচনা ঘটে (সেলিম, ২০০৭ : ২৬)। জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), কামরুল হাসান (১৯২১-৮৮), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), এস. এম. সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) হাত ধরে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চা (জুঁই, ২০১২)। কোলকাতার ইউরোপীয় একাডেমিক রীতিতেই এঁদের চিত্রচর্চার সূচনা, পরে ক্রমশ বিভিন্ন লোকশিল্পের অনুষঙ্গ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক নানান রীতির প্রভাবসমূহ এসেছে। এ সময়ে জলরং, গোয়াশ, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পীরা চর্চা করেন। এছাড়াও শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন নির্বস্তুক নিরীক্ষাধর্মী ছবিও এঁকেছেন। যেখানে উপকরণে ও কৌশলে এসেছে বৈচিত্র। তাদের ছবিতে রেখা এবং রং, প্রধানত রঙের প্রলেপনগুলো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশলকে সর্বতোভাবে বোধের আয়ত্তে এনে বিমূর্ত ফর্মের মাধ্যমে নিজেদের কলাকৌশলকে প্রকাশ করেছেন (আহসান, ১৯৮৩ : ২৩১)।

মানবতাবাদী শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) এ উপমহাদেশের পূর্ব শিল্পকর্ম থেকে ভিন্ন মেজাজের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন চিত্রসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প নিছক শিল্পের জন্য নয়, শিল্প সর্বাংশে জীবনের জন্য। আর এ কারণে জীবনধর্মিতাই তাঁর শিল্পকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি বিভিন্ন সময় জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মানুষ ও প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন। যার ফলে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ভিন্নতা তাঁর কাজের মধ্যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর শৈশবের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্প মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিভিন্ন স্বল্প রং ও বলিষ্ঠ রেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সমগ্র বাংলার লোকজীবন। বিষয়বস্তুতে যেমন–বিচিত্রতা ছিল, তেমনি উপকরণ ও শৈলীগত বৈচিত্রসমৃদ্ধ জয়নুলের শিল্পকর্ম। তিনি কাঠপেন্সিল, চারকোল, কালি তুলি, কালি কলম, রঙিন পেন্সিল, খাগের কলম ও কালি, বিভিন্ন ধরনের আর্ট পেপার এবং সাধারণ কাগজে মূল ড্রইং ও স্কেচগুলো সম্পন্ন করেছেন। অপেক্ষাকৃত মোটা বোর্ড কাগজও ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় (চিত্র-৭) উপকরণ ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। তিনি তুলিকে কখনো কোমল কখনো শুষ্ক-কর্কশ, রঙের ঘনত্বের তারতম্য এবং কাগজের পটভূমিকে কাজে লাগিয়েছেন (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৫)। এখানে তিনি অত্যন্ত সস্তা কাগজে

চিত্র-৭ : জয়নুল আবেদিন, দুর্ভিক্ষ, কালি ও তুলি, ১৯৪৩

চিত্র-৮ : জয়নুল আবেদিন, সাঁওতাল দম্পতি, জলরং, ১৯৫১

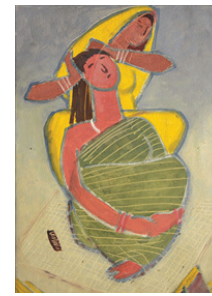

চিত্র-৯ : জয়নুল আবেদিন, প্রসাধন

কাল-কালি ও ক্ষিপ্রতার সাথে তুলি চালনার মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তোলেন।

স্বচ্ছ জল রঙে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যদিও শিক্ষাজীবনে ভারতীয় শৈলীর পরিবর্তে পাশ্চাত্য ধাঁচে তেলরঙে ছবি আঁকাকে বেছে নিয়েছিলেন। জলরং ও তুলি-কালি মাধ্যম দুটি ছাত্রাবস্থা থেকেই ছবি আঁকার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্যারিস ফেরত শিক্ষক বসন্ত গাঙ্গুলীর কৌশল জয়নুলকে আকৃষ্ট করেছিল (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৩, ২৭৫)। এক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন নিজস্ব পদ্ধতিগত কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিদ্রোহী (১৯৫১), মই দেয়া (১৯৫১), কালবৈশাখী (১৯৫১), গ্রাম্য মহিলা (১৯৫৩), কৃষক (১৯৫৩), সাঁওতাল, সাঁওতাল দম্পতি (১৯৫১) প্রভৃতি জলরঙের চিত্রকর্মগুলো উল্লেখযোগ্য। টেম্পারা (এগ টেম্পারা), গোয়াশ ও পোস্টার রং ইত্যাদি মাধ্যমেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। দুই মহিলা (১৯৫৩), পাইন্যার মা (১৯৫৩), গুন টানা (১৯৫৩), পটুয়া ইত্যাদি চিত্রকর্ম গোয়াশ মাধ্যমের সাক্ষ্য বহন করছে। এসব চিত্রের রূপ, বিষয়বস্তু, রং প্রয়োগ, রেখার ব্যবহার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলার লোকরীতির সাথে পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

শিল্পী জয়নুল তেলরঙে প্রচুর কাজ করেছেন। সাপোর্ট হিসেবে ক্যানভাস, ক্যানভাস

চিত্র-১০ : জয়নুল আবেদিন, মনপুরা ৭০, তুলি কালি ও মোম, ১৯৭০

কাগজ, চট, হার্ডবোর্ড, মাউন্টবোর্ড ইত্যাদি নির্বাচন করেছেন। তেলরঙে তাঁর যেসব কাজ বেশি সমাদৃত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–চায়ের স্টল (১৯৪৩), পাঠরত (১৯৫৩), প্রসাধন (১৯৬৭), রমণীরা (১৯৭৩), স্নানরতা (১৯৭৬)। অ্যাক্রেলিক-এ শিল্পী জয়নুলের কাজের মধ্যে দুই মুখ (১৯৭০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়নুলের চিত্রে তেলরং ও টেম্পারা; মোম, কালি ও জলরং; কালি ও মোম; রঙিন কালি ও কলম প্রভৃতি মিশ্র মাধ্যমগুলোর উপস্থিতি রয়েছে, অন্যদিকে ছবি আঁকার পাশাপাশি শিক্ষক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রচ্ছদ-অঙ্কন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত

ইলাস্ট্রেশনের কাজেও যুক্ত হতে দেখা যায় (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৬)। সংগ্রাম (তেল ও টেম্পারা), নবান্ন (মোম, কালি ও জলরং), মনপুরা ৭০ (কালি ও মোম), ট্রাফিক পুলিশ (১৯৪৯), মুক্তিযোদ্ধা (কালি ও ওয়াশ) প্রভৃতি বিখ্যাত কিছু শিল্পকর্ম মিশ্রমাধ্যমে সৃষ্টি। জয়নুলের 'নবান্ন' ও 'মনপুরা ৭০' শীর্ষক স্ক্রোলচিত্রে বাংলার মানুষের সংগ্রামী স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'নবান্ন' চিত্রটিতে কাগজের উপর মোম, কালি ও জলরঙের মাধ্যমে তিঁনি বাংলার গ্রামজীবনের একটি চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছেন (আজিজুল, ২০০৪ : ২২)। বিষয়গতভাবে নবান্ন যেমন–বাঙালির সর্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য, তেমনি এই চিত্রের উপকরণ এবং আয়োজনেও আছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জড়ানো-পটচিত্রের আবহ (হোসেন, ২০০৭ : ২৮২)। অন্যদিকে 'মনপুরা ৭০' স্ক্রোলচিত্রে তিনি তুলে ধরেছেন কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের এক করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা (আজিজুল, ২০০৪ : ২২)। দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার মতো এখানেও বিষয়ের সাথে সংহতি রেখে শুধু কালোরং ব্যবহার করা হলেও এতে তুলির আঁচড় ততটা সুনির্দিষ্ট ও তীক্ষ্ণ নয়। বরং ফুলে-ফেঁপে যাওয়া লাশের মতোই কিছুটা নমনীয় ও আলগা ধরনের (হোসেন, ২০০৭ : ২৮৩)। শিল্পী জয়নুল আবেদিন জীবনকে সাধারণ মানুষের মৃত্তিকা ও জলপ্রবাহের মধ্যে আবিষ্কার করে তিনি আমাদের দেশের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মতোই খুব সাধারণ ছিল চিত্রের ভাষা-উপকরণশৈলী।

পটুয়া কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) এপিটাফে উদ্ধৃত আছে–"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো ঠাঁই"। চরণদ্বয়ের সত্যতা নিরূপিত হয়েছে আজ ও আগামী দিনে তাঁর অবস্থানের সূত্র ধরে। কেননা তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই চিরজীবী হয়ে আছেন ও থাকবেন। বাংলার লোকঐতিহ্য চেতনা ছিল কামরুল হাসানের শিল্প-সৃষ্টির আদর্শ। তিনি পটুয়াদের শিল্পরীতি ও রং গ্রহণ করেছিলেন (আজিজুল, ২০০৩ : ২৩)। সত্তর-আশির দশকে এসে তিনি লোককলার সঙ্গে আধুনিক শিল্পবৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে শিল্পরীতির প্রদর্শন করেন, তা যেন যামিনী রায়কে অতিক্রম করে এসেছে অনেক দূর। বলা হয়ে থাকে, "যামিনী রায়ের যেখানে শেষ কামরুল হাসানের শুরু ঐখান থেকেই।" (আজিজুল, ২০০৩ : ২৪)। তিনি প্রাথমিক রং হলুদ, লাল, নীলসহ উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছেন। মাতিস

আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রাচ্যের আলংকারিক নকশায়–উজ্জ্বল লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ রঙে তেমনি কামরুলের ছবিতে ও নকশার উপস্থাপনাতে সমমনতা লক্ষ করা যায় (জামান, ১৯৯৮ : ১১৪)। তিনি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন তেল রং, জল রং, গোয়াশ, টেমপারা, প্যাস্টেল ও পোস্টার রং। ড্রইংয়ের ক্ষেত্রে কালি, তুলি, পেন্সিল, চারকোল ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। ক্যানভাস, হার্ডবোর্ড, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন চিত্রের সাপোর্ট হিসেবে। এছাড়া কাঠখোদাই, লিনোকাট, এচিং, সেরিগ্রাফ, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি ছাপচিত্রের পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে কমার্শিয়াল কাজের অগ্রদূত কামরুল হাসান। তিনি বাংলাদেশের

চিত্র-১১ : কামরুল হাসান, উঁকি, গোয়াশ, ১৯৬৭ ও মোম, ১৯৭০

চিত্র-১২ : কামরুল হাসান, স্নান, তেলরং, ১৯৬৬

জাতীয় পতাকার নকশা যেমন–করেছেন তেমনি দেশের জাতীয় প্রতীক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, পর্যটন কর্পোরেশন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইত্যাদির মনোগ্রাম এঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক তাই যথার্থই বলেছেন,

> বইয়ের প্রচ্ছদ কিংবা অঙ্গসজ্জা কিংবা পত্রিকার অলংকরণ সবকিছুতে বিষয়ানুযায়ী ড্রইং, তদনুরূপ মোটিফ ও রং ব্যবহারের ফলে কামরুল হাসানের ব্যবহারিক শিল্পচর্চাও তাৎপর্য অর্জন করেছে। ক্যালিগ্রাফিতেও

> তিনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই না, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাও যে চিত্রকলার পাশাপাশি ভিন্ন একটি মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে গ্রাফিক গুণই মুখ্য, সেই বোধটিও এদেশে কামরুল হাসানই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। (আজিজুল, ২০০৭ : ২৯৬)

গুণটানা (জলরং, পঞ্চাশের দশক), তিন কন্যা (তেলরং, ১৯৫৫), স্নান (লিথোগ্রাফ, ১৯৫৮; তেলরং, ১৯৬৬), সুখী প্রত্যাবর্তন (তেলরং, ১৯৬০; নাইওর নামে ১৯৭৫-এ অঙ্কিত), উঁকি (গোয়াশ, ১৯৬৭), বাউল (জলরং, ১৯৬৭; লিনোকাট, ১৯৭৪; তেলরং, ১৯৭৭), জেলে (জলরং, ১৯৬৭; তেলরং, ১৯৮২), গরুর স্নান (জলরং, ১৯৬৭), মৎস্য স্বপ্ন (লিনোকাট, ১৯৭৪), মীন ও বিড়াল (গোয়াশ, ১৯৭৪), নবান্ন (জলরং, ১৯৭৭) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্রের নাম (আজিজুল, ২০০৭ : ২৯১-২৯২)।

চিত্র-১৩ : কামরুল হাসান, তিন কন্যা, তেলরং, ১৯৫৫

মাধ্যম হিসেবে স্কেচ এবং কালো-কালি প্রধান্য পেয়েছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এবং বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক প্রতিবাদমূলক কার্টুনচিত্রে, যেমন–মুক্তিযোদ্ধা (স্কেচ, ১৯৭১), মুক্তিযোদ্ধা রমণী (কালো কালি, ১৯৭১), ১৯৭১-এর সেইসব জানোয়ারের জের টেনে (স্কেচ, ১৯৭২), দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে (স্কেচ, ১৯৮৮)। দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা কামরুল হাসানের মধ্যে সর্বদা অটুট ছিল, যার অন্যতম নিদর্শন হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর আঁকা ইয়াহিয়ার দানবাকৃতি সংবলিত পোস্টারচিত্র "এই জানোয়ারদের হত্যো করতে হবে"। স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশের কিছু শ্রেণির মানুষের ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতার প্রতিবাদসরূপ যে প্রতীকী চিত্রমালার সৃষ্টি করেছেন তাতে ব্যবহার করেছেন সাপ, গিরগিটি, শৃগাল, কচ্ছপ প্রভৃতি। কামরুল হাসানের খেরো খাতাও তাঁর শিল্পকর্মের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিভিন্ন রঙিন কলমের ছোঁয়ায় তাঁর সুন্দর লেখনী

শিল্পের রূপ ধারণ করেছে নানান রং, ড্রইং ও ডিজাইনের মাধ্যমে। তিনি বর্ণ, রেখা ও গড়ন এই উপাদানের কোনো একটিকে প্রধান্য দিয়ে ছবি রচনা করেন, কখনো প্রতীকের মিছিলের আয়োজনে আমৃত্যু স্বদেশের অপশাসকের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন শিল্পী কামরুল (খালেদ, ২০০০ : ৪৭)।

কামরুল হাসানের চিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে নারী। তাঁর চিত্রে নারীকে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক। নারীসৌন্দর্য ও প্রকৃতির মাঝে তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, জনজীবন, নিসর্গ ও নারীর একাত্মতা, প্রতীকায়ন ও প্রতিবাদ প্রভৃতি উপস্থাপন করেছেন অবলীলায়।

দীর্ঘদিনের একব্রতী বিরামহীন শিল্প সাধনায় সৃজন উদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২)। তাঁর নানা মাধ্যমের কাজে আমরা যে সৃজনী উৎকর্ষ ও পরিশীলিত আবেগ প্রত্যক্ষ করেছি, নানা দিক থেকে আমাদের চিত্রকলার ভুবনে তা হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী ও বিদিত হবার মতো ঘটনা। ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের এই প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পীর কাজে লোকশিল্পের শান্ত-স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে ওঠে। তার কাজে আমরা দেখি ফরমের বিমূর্ত রূপায়ণ। পঞ্চাশ দশকের শিল্পী বেশ কিছুদিন ইউরোপে কাটান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর শিল্পকলায় আন্তর্জাতিক পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ে।

শিল্পী শফিউদ্দিন এচিং আর উড এনগ্রেভিংয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও তিনি প্রথম সম্মান পেয়েছিলেন তেল চিত্রের জন্য। দুমকা-১ (তেলরং, ১৯৪৬), দুমকা-২ (তেলরং, ১৯৪৬), শালবন দুমকা (তেলরং, ১৯৪৬), থ্রেশিং প্যাডি (তেলরং, ১৯৫২), মাছ ধরা (তেলরং, ১৯৫৬) কাঠমিস্ত্রি (তেলরং, ১৯৫৬) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত তেলরং চিত্র। তাঁর তেলরঙে আঁকা চিত্রাবলীতে কখনো ইমপ্রেশনিস্টদের মতো ছোপ দিয়ে দিয়ে রঙের ব্যবহার আবার কখনো আলো ছায়ার মাধ্যমে আকারগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস পায় (সোম, ২০০৭ : ৩০২-৩০৩)। তিনি যতক্ষণ না মনে করেন ছবি পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করেছে ততক্ষণ এ ছবিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়, সৃষ্টির অপূর্ণতা ও পূর্ণতা আনয়নে ক্রমাগত কাজ করেই যান। সে চিত্র হোক কিংবা তাম্রতক্ষণ (জামান, ২০০৮ : ৩)। তিনি ছবিতে ফ্লাটভাবে রং ব্যবহার করেন। রং দিয়ে বিভিন্ন ফর্ম ও

শেপ তৈরি করেন। সাপোর্ট হিসেবে চিত্রে তিনি ক্যানভাস, হার্ডবোর্ড, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি চারকোলে বহুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর তেল রং ও এনগ্রেভিং সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মাধ্যম হলেও একটি আরেকটির সম্পূরক। তামার প্লেটে কিংবা কাঠে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর কুশলী হাতের স্ট্রোকে চিত্রের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলেন অসামান্য দক্ষতায়। গৃহাভিমুখী (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৪) ছাপচিত্রটিতে আকাশে বাহারি মেঘ ও ধানগাছের ডগায় আলো এনেছেন কাঠের রৈখিক খোদাই-এর মাধ্যমে। সাঁওতাল রমণী (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৬), গুনটানা (এনগ্রেভিং, ১৯৫৮), বন্যা, মাছ ধরার সময়, নেমে যাওয়া বান, সেতু পারাপার (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯) ইত্যাদি তাঁর চমৎকারিত্বের কিছু উদাহরণ।

''তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে র'য়ে যাব'' শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) জীবনদর্শন ও শিল্পদর্শনের মূলনীতিই ছিল এটি। কেননা শিল্পী এস.এম. সুলতানের চিত্রের বিষয়বস্তু বাংলার শ্রমজীবী মানুষ। বাংলার সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বকে নয় বরং তাদের তেজদীপ্ত প্রতিমূর্তি আবিষ্কার করা যায় তাঁর চিত্রে। চিত্রশিল্পে একমাত্র তিনিই এরূপ ভিন্ন ধাঁচে মানুষের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ভাষ্য '...জয়নুল, তুমি আমার জাতিকে রুগ্নক্লিষ্ট রূপ দিয়েছো। আমি তাদের মাসল্‌স্ দেব, ঐশ্বর্য ও শক্তি দেব' (আকন্দ, ২০০৭ : ৩১৩)। এই নিভৃতচারী শিল্পী বহুদিন ধরে দেশীয় ভেজষ উপকরণ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ছোটবেলায় সুযোগ পেলেই কাঠ কয়লা, কাচা হলুদ ও পুঁই গাছের ফলের রস টিপে টিপে ছবি আঁকার অভিজ্ঞতাই হয়তো পরবর্তীকালে রং নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস জুগিয়েছে (ছফা, ১৯৯৫ : ১০১-১০২)। তাঁর চিত্রের মূলে রয়েছিল বাংলার মানুষ, মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়া। বাংলার খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে অসাধারণ শক্তির অধিকারী করে দেখেছিলেন। তিনি বৃহদাকার ছবি নির্মাণ করতেন। বেশ বড় বড় কাজেও তিনি স্বল্পস্থায়ী চিত্রাঙ্কন উপাদান ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো তাঁর ছবির ক্যানভাস উন্নতমানের নয়। তাঁর জন্য যে বড় বহরের ক্যানভাসের দরকার হতো সেটা ক্যানভাসে সম্ভব ছিল না বলেই তিনি চটও বেছে নিয়েছিলেন। সাপোর্টে তিনি নিজস্ব কায়দায় গ্রাউন্ড তৈরি করতেন। এ গ্রাউন্ড তৈরির কাজে তিনি গাবের আঠাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতেন। এরপর

যে কাজটি আসে সেটা হলো ছবি অঙ্কন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেই ছবির জন্য রং তৈরি করে নিতেন। এসব রং শেষ পর্যন্ত হয়তো স্থায়ী হয় না (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৬১)। তিনি কাঠ কয়লা দিয়েই বড় সাপোর্টের উপর ড্রইং করে নিতেন। সুলতান বহুদিন ভেষজ আর দেশীয় রং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। গুঁড়া রঙের সঙ্গে কপার বার্নিশ, লিনসিড তেল মিশিয়ে রং তৈরি করার প্রক্রিয়াটি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। তিনি পঁচিশ-তিরিশ ফুট দীর্ঘ এবং পাঁচ-সাত ফুট প্রস্থ-বিশিষ্ট বিশাল পটভূমিসহ ক্যানভাসে মানুষের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তেলরঙে (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৫৭)। তিনি জলরঙে চমৎকার নিসর্গ-দৃশ্য রচনায় পারদর্শী, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৮৭-র প্রদর্শনীতে। এছাড়া ১৯৮৭ সালেই জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকা চিত্রকর্ম তাঁর মাধ্যমগত বিচিত্রতা বহন করছে। মার্কার পেন ও পেন্সিলেও সুলতানের ড্রইং ছিল অনবদ্য (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৫৭-৫৮)। নিসর্গ-২ (১৯৫১), প্রথম বৃক্ষরোপণ (১৯৭৫), গাঁতায় কৃষক (১৯৭৫), চর দখল (১৯৭৬), সচল সবাক ইতিহাস (১৯৭৬), হত্যোযজ্ঞ (১৯৭৬), নবান্ন (১৯৭৬), ধানভানা (১৯৮৬), গ্রামের দুপুর (১৯৮৭), জমি কর্ষণ (১৯৮৭), কৃষকের দাঙ্গা (১৯৮৭), মাছ-কাটা-২ (১৯৮৯), মাছ ধরা-৩ (১৯৯১), জমি কর্ষণে যাত্রা (১৯৯২), ধান কাটা (১৯৯২) ইত্যাদি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী চিত্রকর্ম।

প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে এসেছে সেখানে আমরা সমাজচিত্র, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা ইত্যাদি পাচ্ছি। সুতরাং ঐ সময়কালের সমাজচিত্র যদি কোনো পাবলিকেশন প্রকাশিত হয় সেখানে এই চিত্রগুলো ইলাস্ট্রেশন হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার খুবই উপযোগী। ডকুমেন্টারি হিসেবে এই চিত্রগুলোর অনেক মূল্য রয়েছে। এই ডকুমেন্টারি চিত্রগুলো বর্তমান শিল্পীদের পথপ্রদর্শক। বর্তমানে শিল্পীদের প্রতিবাদী ইচ্ছার যে প্রকাশ তা থেকে উপকরণ ও শিল্প স্বভাবের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে সমসাময়িককালে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের উপকরণের বৈচিত্র্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চিত্রকলার স্বভাবের উপকরণ ও করণকৌশলে দেখা দিয়েছে নতুনত্ব। বিশ্বশিল্প আঙ্গিকের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চিত্রকলারও ক্রমরূপান্তর ঘটেছে। ক্রমবিকাশের এই ধারায়

বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলার প্রতিটি শাখার মধ্যে চিত্রকলার স্থান হয়ে উঠেছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে আমাদের সমকালীন চিত্রকলা দ্রুতই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার পূর্বতন অবস্থার বদল ঘটিয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক রূপ লাভ করছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূলমন্ত্র অথবা পথপ্রদর্শন করেছে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা, যা বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. Jonathan Stephenson, The Materials and Techniques of Paintings, Thames and Hudson, 1993.

২. অশোক মিত্র, ছবি কাকে বলে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি :, কলকতা, ২য় প্র : ১৯৮৮।

৩. ড. রফিকুল আলম, উপমহাদেশের শিল্পকলা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৪. সরসীকুমার সরস্বতী, পাল যুগের চিত্রকলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, ১৯৭৮।

৫. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা, আধুনা প্রকাশনা, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৬।

৬. কবির আহমেদ আকন্দ, মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

৭. প্রদ্যোৎ গুহ, কোম্পানি আমলের বিদেশি চিত্রকর, কোলকাতা, ১৯৭৮।

৮. তোফায়েল আহমেদ, "পট ও পটুয়া," শিল্পকলা ষাণ্মাষিক বাংলা পত্রিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অষ্টাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৯৮।

৯. অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কোলকাতা, ৩য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

১০. আহমদ রফিক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প, আনন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

১১. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

১২. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় প্র: আগস্ট ১৯৮৩।

১৩. রফিক হোসেন, বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, আগস্ট ২০০৭।

১৪. সৈয়দ আজিজুল হক, কামরুল হাসান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৩।

১৫. ফরিদা জামান, আধুনিক চিত্রকলায় লোকশিল্পের প্রভাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৮।

১৬. মইনুদ্দীন খালেদ, বাংলাদেশের চিত্রশিল্প, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

১৭. শাওন আকন্দ, 'এস. এম. সুলতান', লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

১৮. মাহমুদ আল জামান, কাজী আবদুল বাসেত, আর্ট অফ বাংলাদেশ সিরিজ ১২, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৪।

১৯. মাসুদা খাতুন জুঁই, বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায় : একটি পর্যবেক্ষণ, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ২, ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

২০. নজরুল ইসলাম, সুলতানের শিল্পকর্ম, এস এম সুলতান স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫।

২১. সৈয়দ আজিজুল হক, নিসর্গ ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৪।

২২. নিসার হোসেন, জয়নুল আবেদিন, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৩. সৈয়দ আজিজুল হক, কামরুল হাসান, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৪. শোভন সোম, সফিউদ্দিন আহমেদ, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৫. আহমদ ছফা, অভিনব উদ্ভাসন, এস এম সুলতান স্মারকগ্রন্থ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫।